তন্ত্রসাধিকা ও অবিশ্বাসী

অনিরুদ্ধ রাহা

পুনশ্চ

সূচিপত্র

ভরকেন্দ্র	৯
তন্ত্রসাধিকা ও এক অবিশ্বাসী	৬৩

।। ভরকেন্দ্র ।।

মজুমদার ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে পায়ে পায়ে বসাক মেডিসিন স্টোর-এর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় বিপুল। পকেট থেকে টাকাগুলো বার করে আর একবার গোনে। সব মিলিয়ে তিনশো সতেরো। মাসের আজ সাতাশ তারিখ। একত্রিশে মাস। একটা দিন বেশি মানে আরও ষাট টাকা। এ মাসে তিরিশ তারিখ পর্যন্ত টানতে পারলে তবে একত্রিশে মাইনে। তার মানে ষাট টাকা হিসাবে তিনদিনে একশো আশি। হাতে থাকল একশো সাঁইত্রিশ।

দোকানের কাউন্টারে প্রেসক্রিপশনটা এগিয়ে দেয় বিপুল। ভয়ে ভয়ে তাকায় কাউন্টারের লোকটির দিকে।

'কতদিনের দেব?'

'কতদিনের...?'

'হ্যাঁ, বলতে হবে তো..এসব ওষুধ তো অনেকদিন খেতে হবে...কতদিনের জন্যে দেব?'

মানে একশো টাকার মধ্যে...'

'একশো টাকা...দাঁড়াও, হিসেব করে দেখতে হবে। দাঁড়াতে হবে। খদ্দের ছেড়ে তারপর দেখছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ... আমার তাড়া নেই।'

মিনিট পনেরো পর ওষুধগুলো বার করে দাম হিসাব করে লোকটি বলে 'সাতদিনের মতো হতে পারে...দেব?'

'হ্যাঁ...দিয়ে দিন'।

ওষুধগুলো নিয়ে দোকানের বাইরে এসে হাঁটতে থাকে বিপুল। পা চালিয়ে যেতে পারলে হয়তো মন্টুদাকে এখনও অনিলদার চায়ের দোকানে পাওয়া যাবে। কাজের কথাটা আজ আর একবার ওকে বলতেই হবে। কানাঘুষো যেটুকু শুনেছে, তাতে করে আর বেশিদিন আলো জ্বালানো কাজটা থাকবে বলে মনে হয় না। সেদিন উত্তমের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে এতদিন যা ছিল আশঙ্কা, এখন তা সত্য বলেই জেনেছে বিপুল। উত্তমের এলাকায় রাস্তার সব আলো পালটে গিয়ে নতুন রকমের আলো লাগানো হয়ে গেছে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না বিপুল, কিন্তু উত্তম বলল যে আশ্চর্য ব্যাপারটাই ঘটেছে এবং ঘটছে রোজ।

'নতুন আলো লাগালে আমাদের কাজ থাকবে না কেন?'

'কাজ থাকবে কেমন করে? ওগুলো তো নিজে নিজে জ্বলে, নিজে নিজেই নিভে যায়।'

'আলো নিজে নিজে জ্বলে নেভে? টুনি লাইটের মতো? তাহলে তো একবার আলো আর একবার অন্ধকার হয়ে যাবে!'

'আরে না, না...সন্ধ্যা হবার আগেই নিজে নিজে জ্বলে ওঠে। সারা রাত জ্বলে। ভোর হলে নিজের থেকেই নিভে যায়।'

'যাঃ! নিজে নিজে নেভে? কেমন করে?'

'কেমন করে আমি জানি না। কিন্তু হয়...'

'তুমি দেখেছ?'

'দেখেছি...আমার নিজের চোখে দেখা।'

'আমার বিশ্বাস হয় না।'

'বিশ্বাস না হলে একদিন এসো...নিজেই দেখবে।'

দেখতে গিয়েছিল বিপুল। সন্ধ্যা হতে না হতেই জ্বলে উঠল আলো। যতদূর চোখ যায় রাস্তার দুধারের সার সার আলো জ্বলে উঠল নিজে নিজেই। উত্তম বলেছিল, 'কী...এবার বিশ্বাস হল তো? ভোর হবার পরপর নিভেও যাবে নিজে নিজে।'

'তাহলে তো!'

'তাহলে আর কি...অন্য কাজ খুঁজে নাও। সময় থাকতে থাকতে। নাহলে আমার মতো অবস্থা হবে...মাসখানেক কোনো কাজ পাই না...তারপর কোনো রকমে দোকানদারদের ধরে নাইট গার্ড-এর একটা কাজ পেলাম...'

'রাত পাহারা?'

'হ্যাঁ, ওই হুইসিল মেরে মেরে ঘুরে বেড়ানো।'

'একা একা রাতে ভয় করে না?'

'একা কেন? আমার মতো আরও একজন আছে। এদিক থেকে ওদিক আমি যাই তো আর একজন ওদিক থেকে এদিকে আসে।'

'আর একজন?'

'সে বাজার কমিটির লোক। বসে বসে ঘুমায়। মাঝে একবার দুবার ঘোরাঘুরি করে, আবার ঘুমায়।'

'তাতেই পয়সা পায়?'

'বাজার কমিটির লোক...ওর পয়সা কে মারবে?'

সেদিন থেকেই বুঝে গেছে বিপুল। পুরোনো লাইট বাতিল করে নতুন লাইট লাগলেই ওর কাজও চলে যাবে। এক এক করে সব রাস্তায় নতুন লাইট বসবে। ওর এলাকায়

এখনও বসেনি, কিন্তু যে কোনোদিন কাজ শুরু হয়ে যাবে। মন্টুদাকে সেই কথাই বলেছিল বিপুল। অনিলদার চায়ের দোকানেই আলাপ। সপ্তাহে তিনচারদিন আসে। মন্টুদা এলে ছ-সাতজন তো ওকে ঘিরে রাখবেই। দুহাতে পয়সা খরচ করে মন্টুদা। চা বিস্কুট যত খুশি খাও। টোস্ট ঘুগনিও খাওয়ায় মাঝে মাঝে। পকেটে সব সময়ে লম্বা লম্বা সিগারেটের কুড়িটার প্যাকেট। অকাতরে সিগারেট বিলোয় মন্টুদা। এত পয়সা কোথায় পায় কেউ জানে না। কী করে তাও জানে না বিপুলরা। তবে মন্টুদার অনেক যোগাযোগ। কাউন্সিলরের সঙ্গে তার গাড়িতেও মন্টুদাকে দেখেছে অনেকে। তবে যাই করুক না কেন, মন্টুদা সকলের উপকারই করে। এই তো সেবার, বিল্বর মা কলঘরে পড়ে গিয়ে কোমর ভাঙল। বিপুলরা তখন চায়ের দোকানে। মন্টুদাও ছিল। বিল্বর মাকে হাসপাতালে ভরতি করা থেকে চিকিৎসার টাকা জোগানো; মন্টুদাই তো করল সব। কদিন পর বিল্বর একটা কাজের ব্যবস্থাও করে দিয়েছে মন্টুদা। বিল্ব এখন বিড়ি ছেড়ে উইলস ফ্লেক সিগারেট খায়।

পা চালায় বিপুল। মন্টুদাকে ধরতেই হবে আজ। যে কোনোদিন কাজটা চলে যাবে। উত্তম অবশ্য বলছিল, অন্য কোনো কাজের ব্যবস্থা করে দেবে হয়তো কর্পোরেশন। কিন্তু সে হতে হতে কত দিন তা বলা যায় না। তাছাড়া হয়তো একে তাকে ধরতে হবে। কাকে ধরতে হবে তাও তো জানে না বিপুল। এই শহরের কতটুকুই বা জানে সে। মাত্র ক'বছর তো এসেছে। বাবা কাজ করত সামন্তবাবুদের দোকানে। বিপুল আর তার ছোটোবোন সবিতাকে নিয়ে মা থাকত সুন্দরপুরে। মাসে, দুমাসে একবার বাড়ি যেত বাবা। টাকা পয়সা যা দিয়ে আসত তাতে দুবেলার ভাতটুকু হয়ে যেত। গাঁয়ে এর তার বাড়িতে এটা ওটা কাজ করে কিছু টাকা রোজগার করত মা। সব মিলিয়ে চলে যাচ্ছিল। মাধ্যমিক পাশ করে সুন্দরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে উচ্চমাধ্যমিক পড়ছিল বিপুল। ভালো ছাত্র বলে নামও ছিল মাস্টারমশাইদের কাছে। ইতিহাসের অমূল্যবাবু স্যার ওকে বলতেন, 'তোর বাবাকে বলব, কলকাতার কলেজে ভরতি করে দেবে। ইতিহাস পড়বি...এম. এ পাশ করবি, তারপর আমার মতো মাস্টারি করবি! গাঁয়ের ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বালাতে হবে তো!'

অমূল্যবাবুর সব কথা না বুঝতে পারলেও, স্বপ্নের ভাষাটা কেমন করে যেন দোলা দিয়ে যেত কিশোর বুকে। আর কাউকে সে কথা না বললেও সতীকে সে কথা বলত বিপুল। ঘোষাল পুকুরের পাড়ে বড়ো জামগাছটার নীচে জাম কুড়োতে যেত ওরা স্কুল থেকে ফেরার পথে। কত কথাই তো হত তখন। সতী অবশ্য বেশি কথা বলত না, কথা বলে যেত বিপুল। বড়ো বড়ো চোখ মেলে শুনত সতী। বিপুল জানে, সব কথা সে বুঝত না। বোঝার কথাও না। সুন্দরপুরের উচ্চবিদ্যালয়ের ক্লাস নাইনের মেয়ে কেমন করেই বা বুঝবে ফরাসি বিপ্লব বা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট! বিপুল জানত সতী বুঝতে পারছে না। তাতেই তো সাহস পেত বিপুল। অমূল্যবাবু স্যারের মুখ থেকে শোনা কাহিনিগুলো

নিজের মতো করে বলতে গিয়ে নিজের বোঝার দুর্বলতাটাও তো বুঝতেই পারত বিপুল। সেটুকু দুর্বলতা সতী বুঝতেও পারবে না এই ভরসায় কথা বলতেই থাকত বিপুল। অবাক বিস্ময়ে শুনত সতী। ঘোষালপুকুরের বড়ো জামগাছতলায় ওদের অজান্তেই সৃষ্টি হত আশ্চর্য এক দুনিয়া। বাস্তব, কল্পনা আর না দেখা স্বপ্নের অনাবিল মিশেলে তখন মনের ক্যানভাসে অদৃশ্য ছবির রামধনু রঙ। তেমনই এক মুহূর্তে, কথা বলতে বলতে, হঠাৎ কথা থামিয়ে ছটফট করতে করতে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে বিপুল। দিশাহারা সতী। স্বাভাবিক সংকোচে ছুটে গিয়ে ডাকতেও পারছে না কাউকে। স্কুল থেকে ফেরার পথে ঘোষাল পুকুরের পাড়ে বিপুলের সঙ্গে এই সাক্ষাতটুকু তো সকলের নজর এড়িয়ে। বাড়ির লোকে জানলে কি জানি কী বলবে, এ বোধ তো অজান্তেই বাসা বাঁধে। ছটফট করছে বিপুল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় সতী ছুটে গিয়ে ঘোষালপুকুর থেকে আঁজলা করে জল এনে ছিটিয়ে দেয় বিপুলের মুখে চোখে। সে তো জানত না, যে ছোটোবেলা থেকে বিপুলের ফিটের ব্যামো। কোন্ ছোটোবেলায় একবার নিদারুণ জ্বরে খিঁচুনি হয়েছিল। তারপর থেকে কখনো-কখনো খিঁচুনি হয়। সভয়ে তাকিয়ে ছিল সতী। বিপুলের মাথাটা তুলে নিয়েছিল নিজের কোলে। কিছু সময় পার হলে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় বিপুল। চোখ মেলে দেখে, ঘোষাল পুকুরের পাড় ছাড়িয়ে বিস্তৃত ধানখেতের দিগন্তের রাঙা অস্তরাগ ছুঁয়ে গেছে সতীর কপোল, চিবুক। ওদের অজান্তে, সেই মুহূর্তে ওদের অজান্তেই জন্ম নিয়েছিল এক সম্পর্ক।

'জীবন ডাক্তারের ওষুধ খেতে ভুলে গেছি দুদিন।'

'রোজ হয় এমন?'

'না...কখনো-কখনো। ছোটোবেলায় জ্বর হয়েছিল, তখন থেকে মাঝে মাঝে...ওষুধ খেলে ভালো থাকি।'

'তাহলে ওষুধ খাও না কেন?'

'খাই তো...কোনোদিন ভুলে গেলে...'

'সারবে না?'

'ডাক্তার বলেছে অনেক সময় লাগবে।'

সেদিন আর কথা বলেনি সতী। কিন্তু তারপর দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করত, 'ওষুধ খেয়েছ?'

ঘোষালপুকুরের জামতলায় তন্ময় হয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকত কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে অপেক্ষারত ছেলেটা। হয়তো ওরা ভেবেছিল সময় এমন ভাবেই এগিয়ে চলে। কিন্তু সব ওলটপালট করে দিল গজেন সাহার নিয়ে আসা খবরটা। রোজকার মতো সেদিনও স্কুলে বেরোচ্ছিল বিপুল আর সবিতা। গজেন কাকাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে ওরা ভেবেছিল বাবা টাকা পাঠিয়েছে। বাড়ি আসতে না পারলে গজেন কাকার হাতে টাকা পাঠায় বাবা। সেও তো কাজ করে কলকাতার কলুটোলায়।

গজেন কাকা দাঁড়িয়ে পড়ল ওদের দুজনকে দেখে। ওদেব পিছনেই আসছিল মা। হাসিমুখে গজেন কাকাকে অভ্যর্থনা জানাতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মা।

'পারলাম না বউদি...আমরা পারলাম না! মাত্র তিনদিনের জ্বরে সুফলদা...আমি কিচ্ছু করতে পারলাম না।'

বুঝতে পারে না বিপুল। অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকায়। দিশাহারা মা ছুটে এসে সব ভুলে আঁকড়ে ধরে গজেন কাকার হাত। 'কী বলছেন আপনি? কেন বলছেন এমন কথা?'

ততক্ষণে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে ছোটো লরিটা। যতটা পেরেছে ফুলে ফুলে ঢেকে বাবাকে পাঠিয়েছে সামন্তবাবুরা।

বিপুল শ্মশান থেকে ফিরছিল মা আর সবিতাকে নিয়ে।

পাটখেতের আড়ালে আড়ালে ওদের অনুসরণ করছিল সতী। বিপুলের চোখে চোখ পড়তেই কত কথাই যেন বলতে চায় সে। কিন্তু কথা তো হল না আর। শ্রাদ্ধ শান্তি মিটে যাবার কদিন পর, মা বলল, 'সামন্তবাবুদের কাছে যাবি একবার? যদি কোনো...'

কথাটা শেষ করতে পারেনি মা। মাও তো জানত অমূল্য মাস্টার তার ছেলেকেও মাস্টার করতে চায়। ছেলের হাত ধরে গাঁয়ের ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বলবে। কথাটা তাই শেষ করতে পারেনি মা। কিন্তু স্বপ্ন তো চিরকালই হার মেনেছে ক্ষুধার কাছে। গজেন কাকার সঙ্গে মাথা নীচু করে স্কুলের পাঁচিলের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একবার ইচ্ছা করছিল অমূল্যবাবু স্যারের কাছে ক্ষমা চাইতে, ইচ্ছা করছিল একবার ঘোষাল পুকুরের বড়ো জামগাছতলায় যেতে, কিন্তু বারবার ঘড়ি দেখছিল গজেন কাকা। পাঁচটা তেত্রিশ-এর লোকালটা ধরতে পারলে তবে ন'টার মধ্যে হাওড়া। সাড়ে নটায় কলুটোলার অফিসে ঢুকতে না পারলে, একটা রোজ বাদ।

হাওড়া স্টেশনের ভিড়ে ভয় করছিল বিপুলের। এত মানুষ, এত শব্দ। ওদের সুন্দরপুরে বুড়াবাবার থানে মেলার দিনে মানুষ আসত অনেক। চেনা, অচেনা। কিন্তু ভয় করত না বিপুলের। অচেনারাও কেমন যেন চেনা মানুষেরই মতো ছিল সেখানে। কিন্তু এখানে সব অচেনা। ভয় করছিল। গজেনকাকার হাতটা আঁকড়ে ধরেছিল বিপুল। বুঝতে পেরেছিল গজেনকাকা। ওর পিঠে হাত রেখে বলেছিল, 'ভয় নেই! আমি আছি তো। সব চিনে যাবি ক'দিনে।'

সারাটা দিন গজেনকাকার কলুটোলার অফিসেই বসে ছিল বিপুল। দুপুরে ফুটপাথের হোটেলে ডাল, তরকারি আর ডিমের ঝোল দিয়ে ভাত খেতে খেতে মায়ের কথা মনে পড়ছিল খুব। সন্ধ্যায় সামন্তবাবুদের মৌলালির দোকানে ওকে নিয়ে গিয়েছিল গজেন কাকা।